



অধ্যায় ১৬

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ

অধ্যায় ১৬

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ

এই অধ্যায়ে নিচের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে:

- ✓ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ: সংজ্ঞা, ধরন,
- ✓ বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ
- ✓ আকরিক খনিজ সম্পদ
- ✓ জ্বালানি খনিজ সম্পদ
- ✓ প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের ফলে পরিবেশের উপর প্রভাব
- ✓ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা
- ✓ নবায়নযোগ্যতা
- ✓ সম্পদের প্রাপ্যতার সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থিত একটি ছোট ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। এখানে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপ ব্যবস্থা এবং বঙ্গোপসাগরের সাথে এর ভৌগোলিক অবস্থান এই দেশের উর্বর জমি, নদী, বন এবং খনিজসহ প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাপ্যতার অন্যতম কারণ। দেশটি তার উর্বর কৃষি জমির জন্য পরিচিত, যা এর অধিকাংশ জনসংখ্যার জীবিকা নির্বাহের প্রাথমিক উৎস। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা এবং তেলের মতো খনিজ সম্পদেও সমৃদ্ধ। দেশের উপকূলীয় অঞ্চলগুলো মাছ, চিংড়ি এবং কাঁকড়াসহ বিভিন্ন সামুদ্রিক সম্পদের আবাসস্থল, যা দেশের মৎসশিল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ দেশের টেকসই উন্নয়ন অর্জনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

16.1 বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ

প্রাকৃতিক সম্পদ হলো সেই সকল উপাদান বা পদার্থ যা প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে পাওয়া যায় এবং যার একটি অর্থনৈতিক মূল্য আছে। বায়ু, পানি, মাটি, খনিজ, বন, বন্যপ্রাণী এবং জীবাশ্ম জ্বালানি এগুলো হলো কিছু প্রাকৃতিক সম্পদের উদাহরণ। এই সম্পদগুলো নবায়নযোগ্য কিংবা অ-নবায়নযোগ্য, দুইই হতে পারে। প্রাকৃতিক সম্পদ পৃথিবীতে জীবনকে টিকিয়ে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং খাদ্য উৎপাদন, শক্তি উৎপাদন এবং শিল্প উৎপাদনের মতো মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের জন্য এটি খুবই প্রয়োজনীয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে নানান ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ পাওয়া যায়, তবে তা সর্বত্র সমানভাবে নেই। কোথাও সম্পদ বেশি পাওয়া যায় আবার কোথাও কম পাওয়া যায়। যেসব অঞ্চলে বা দেশের সম্পদ কম রয়েছে সেখানে সম্পদ সংরক্ষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশেও বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে তবে তার অনেকগুলোর পরিমাণ দেশের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম, কাজেই এগুলো আমাদের হিসাব করে ব্যবহার করতে হবে।

বাংলাদেশের যে সকল প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে সেগুলোকে কতগুলো ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন—কৃষিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদ, খনিজ সম্পদ, ভূমি, পানি প্রভৃতি। কৃষিজ সম্পদ খাদ্য উৎপাদনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। মৎস্য সম্পদ দেশের মানুষের আশ্রয়ের চাহিদার বড়ো একটি অংশ পূরণ করে। খনিজ সম্পদ থেকে আমরা জ্বালানি এবং কলকারখানায় বিভিন্ন বস্তু উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল পেয়ে থাকি। এই অধ্যায়ে মূলত বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ ও পানি সম্পদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

16.2 বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ

প্রাকৃতিকভাবে এক বা একাধিক উপাদান নিয়ে গঠিত হয়ে অথবা সামান্য পরিবর্তিত হয়ে যে সকল রাসায়নিক প্রক্রিয়াজাত যৌগিক পদার্থ শিলাস্তরে দেখতে পাওয়া যায় সেগুলোকেই খনিজ পদার্থ বলা হয়ে থাকে। বিভিন্ন পাথর বা শিলার উপাদানগুলো ভূতাত্ত্বিক সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়ে নানারকম খনিজ পদার্থে পরিণত হয়। পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য খনিজ পদার্থগুলোর মাঝে রয়েছে—প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল, কয়লা, আকরিক লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, সোনা, হীরা, টাংস্টেন, চুনাপাথর, কাচবালি, চীনা মাটি, তামা, কঠিন শিলা ইত্যাদি।

বাংলাদেশ খনিজ সম্পদে যথেষ্ট সমৃদ্ধ না হলেও এদেশে বেশ কিছু খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো—প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল, কাচবালি, কয়লা, চুনাপাথর, কঠিন শিলা, চীনা মাটি, নুড়িপাথর, ভারী ধাতুর খনিজ সমৃদ্ধ বালু, ইউরেনিয়াম আকরিক, লোহা ইত্যাদি। বাংলাদেশের খনিজ সম্পদকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: জ্বালানি সম্পদ এবং আকরিক ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ। এই সম্পদগুলোর ভেতর বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সম্পদ নিয়ে নিচে আলোচনা করা হলো।

16.2.1 জ্বালানি সম্পদ

বাংলাদেশের খনিতে প্রাপ্ত জ্বালানি সম্পদের মধ্যে রয়েছে কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং খনিজ তেল। বিভিন্ন শিল্প ও কলকারখানায় শক্তির উৎস হিসেবে এসব খনিজ ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা ও গ্যাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সারাদেশে সরবরাহ করা হয়।

কয়লা : বাংলাদেশে প্রাপ্ত কয়লা প্রধানত বিটুমিনাস, লিগনাইট ও পিট জাতীয়। এর মাঝে বিটুমিনাস

এবং লিগনাইট হচ্ছে উৎকৃষ্ট মানের কয়লা যেগুলোর মাঝে জ্বালানি কার্বনের পরিমাণ 60% থেকে 50%। অন্যদিকে পিট ঠিক কয়লা নয় তারপরেও এটি পিট কয়লা নামে পরিচিত, এর মাঝে জ্বালানি কার্বনের পরিমাণ মাত্র 30-40%-।

দেশে এ পর্যন্ত মোট কয়লাক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে পাঁচটি, এর মাঝে প্রথম আবিষ্কৃত কয়লা খনি হচ্ছে জয়পুরহাটের জামালগঞ্জ। মজুতের ভিত্তিতে সবচেয়ে বড়ো কয়লা খনি হওয়ার পরেও ভূপৃষ্ঠ থেকে অনেক গভীরে হওয়ায় এই খনি থেকে এখনো কয়লা আহরণ শুরু হয়নি। তবে দিনাজপুরের বড়োপুকুরিয়া কয়লাক্ষেত্র থেকে প্রচুর কয়লা উৎপাদন করা হয় যার অধিকাংশ বড়োপুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। অন্য তিনটি কয়লাক্ষেত্র রয়েছে দিনাজপুরের দিঘিপাড়া ও ফুলবাড়ী এবং রংপুর জেলার খালসপীরে। এই কয়লাক্ষেত্র ছাড়াও রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া, নওগাঁ এবং সিলেট জেলায় উৎকৃষ্ট মানের বিটুমিনাস এবং লিগনাইটজাতীয় কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশের মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, মাদারীপুর এবং খুলনার বিভিন্ন এলাকায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পিট মজুতের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রকৃত কয়লা হতে গাছপালা, গুল্মালতার লক্ষ লক্ষ বছর মাটির নিচে তাপ ও চাপে থাকা প্রয়োজন, সে তুলনায় মাত্র কয়েক হাজার বছরেই সেগুলো পিটে রূপান্তরিত হয়ে যায়। বাংলাদেশে প্রাপ্ত পিটের রং বাদামি থেকে ঘন বাদামি। বাংলাদেশে পিট ক্ষেত্রগুলো ভূ-পৃষ্ঠের খুব কাছে থাকার কারণে সহজেই আহরণ করা যেতে পারে। সাধারণত ইটের ভাটায়, বয়লার এমনকি অনেক সময় বাসাবাড়িতে পিট জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

প্রাকৃতিক গ্যাস : বাংলাদেশের শক্তি সম্পদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস প্রাকৃতিক গ্যাস, এটি মূলত মিথেন, প্রপেন, বিউটেনসহ অন্যান্য হাইড্রোকার্বন গ্যাসের মিশ্রণ। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত মোট 29টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে এবং আরও গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের সম্ভাবনা রয়েছে। এর মাঝে কয়েকটি গ্যাসক্ষেত্র থেকে গ্যাস উৎপাদন চলছে, কয়েকটি স্থগিত রয়েছে এবং কয়েকটিতে এখনো গ্যাস উৎপাদন শুরু হয়নি। বাংলাদেশে গ্যাস উৎপাদনের সক্রিয় গ্যাসক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ, কৈলাসটিলা, রশিদপুর, হরিপুর ইত্যাদি। তিতাস গ্যাসক্ষেত্র থেকে উত্তোলিত গ্যাস আশুগঞ্জ ও ঘোড়াশালে অবস্থিত সার কারখানা ও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং সিদ্ধিরগঞ্জ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাস অত্যন্ত উন্নত মানের এবং এতে জলীয় বাষ্প কিংবা অপদ্রব্য খুব কম, মিথেনের পরিমাণ অনেক বেশি (96 - 99%)। দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানির প্রায় 71% প্রাকৃতিক গ্যাস পূরণ করে। পাইপলাইন বা সিলিন্ডারের মাধ্যমে যে গ্যাস রান্নার কাজে ব্যবহার করা হয় সেগুলো প্রাকৃতিক গ্যাস শোধন করে উৎপাদন করা হয়ে থাকে।

খনিজ তেল : 1986 সালে সিলেটের হরিপুরে দেশের একমাত্র খনিজ তেলক্ষেত্রটি আবিষ্কৃত হয়। এ তেলক্ষেত্রে তেলের মোট মজুতের প্রায় 60% উত্তোলন করা হয়েছে। 1994 সালের শুরুতে তেলের উৎপাদন কমে আসার পর উৎপাদন বন্ধ করে দেয়া হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে সঠিক উপায়ে মূল্যায়নকার্য পরিচালনার পর আবার পূর্ণমাত্রায় তেল উৎপাদন করা যেতে পারে।

16.2.2 আকরিক ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ এবং চাহিদার তুলনায় এ দেশ খনিজ সম্পদে যথেষ্ট সমৃদ্ধ নয়। এজন্য নানান প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রকার খনিজ সম্পদ প্রতিবছর অন্যান্য দেশ থেকে আমদানি করা হয়। খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ না হলেও বেশ কিছু খনিজ পদার্থ এদেশে পাওয়া যায় যার মধ্যে অন্যতম হলো— চুনাপাথর, সিলিকা বালু, কঠিন শিলা, নুড়ি পাথর, চীনা মাটি ইত্যাদি।



(ক) কঠিন শিলা



(খ) চুনাপাথর

চুনাপাথর : মূলত সিমেন্ট শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে চুনাপাথর ব্যবহার করা হয়। এছাড়া গৃহনির্মাণ কাজে, কাঁচ শিল্পে, ইস্পাত, সাবান, ব্লিচিং পাউডার, কাগজ কিংবা রং তৈরিতে চুনাপাথর ব্যবহৃত হয়। দেশের প্রথম চুনাপাথরের খনি 1960 এর দশকের শুরুতে সুনামগঞ্জের টেকেরঘাটে আবিষ্কৃত হয়। এছাড়া সুনামগঞ্জের লালঘাট ও বাগলিবাজার, সিলেটের জাফলং, জকিগঞ্জ, চরগা, নওগাঁ জেলার জাহানপুর ও পুরানগর, জয়পুরহাট জেলার জয়পুরহাট ও জামালগঞ্জে চুনাপাথর পাওয়া যায়।

সিলিকা/ কাচবালি: এটি কাঁচ উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল। এছাড়া রং ও বিভিন্ন রকমের রাসায়নিক তৈরিতে এর ব্যবহার আছে। বাংলাদেশে কাচবালির মজুত উল্লেখযোগ্য। কাচবালি হলো সূক্ষ্ম থেকে মাঝারি আকৃতির কোয়ার্টজ এবং সেগুলো হালুদ থেকে ধূসর বর্ণের হয়ে থাকে। ভূপৃষ্ঠের উপরে বা ভূ-পৃষ্ঠের অগভীরে বালিজুরী, শাহজিবাজার ও চৌদ্দগ্রামে এবং ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে মধ্যপাড়ায় ও বড়োপুকুরিয়ায় কাচবালির বড়ো মজুত আবিষ্কৃত হয়েছে।

কঠিন শিলা/পাথর : ঘরবাড়ি, রাস্তা, রেললাইন, নদীর বাঁধ ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণে কঠিন শিলার প্রচুর ব্যবহার হয়। রংপুর জেলার বদরগঞ্জ থানার রানীপুকুর নামক স্থানে 1966 সালে প্রথম কঠিন শিলার সন্ধান পাওয়া যায়। বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর পরবর্তী সময়ে দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়া নামক স্থানে কঠিন শিলার মজুত আবিষ্কার করে। এছাড়া নওগাঁ জেলার পত্নীতলা, সিলেটের

ভোলাগঞ্জ এবং পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় কঠিন শিলা পাওয়া যায়।

চীনা মাটি : চীনা মাটি মূলত কেয়োলিন নামক কাদা খনিজ দিয়ে গঠিত উন্নতমানের কাদাকে বোঝানো হয়ে থাকে। চীনা মাটি মূলত সিরামিক শিল্পে বিভিন্ন তৈজসপত্র, স্যানিটারি জিনিসপত্র, বাসন, বৈদ্যুতিক ইন্সুলেটর ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। ভূপৃষ্ঠে বা ভূপৃষ্ঠের সামান্য নিচে নেত্রকোণা জেলার বিজয়পুর, শেরপুর জেলার ভুরুংগা ও চট্টগ্রাম জেলার হাইটগাঁও, কাঞ্চপুর, এলাহাবাদ এবং ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায় চীনা মাটির মজুত আবিষ্কৃত হয়েছে।

নুড়িপাথর : দেশের উত্তরাঞ্চলীয় সীমান্ত এলাকায় হিমালয়ের পাদদেশ বরাবর নুড়িপাথর পাওয়া যায়। এগুলো বর্ষাকালে উজান এলাকা থেকে নদী দ্বারা বাহিত হয়ে আসে। নুড়িপাথর বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমে ব্যবহার করা হয়।

নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত বালি : বাংলাদেশের উপর দিয়ে অসংখ্য নদনদী প্রবাহিত হয়েছে যা এ দেশকে নদীমাতৃক দেশ বলার অন্যতম কারণ। দেশের বিভিন্ন নদনদীর তলদেশে (River bed) এ ধরনের বালি পাওয়া যায়। মূলত মাঝারি থেকে মোটা দানার কোয়ার্টজ-এর সমন্বয়ে এই বালি গঠিত। অন্যান্য মনিক বা মিনারেলও এই বালিতে মিশ্রিত থাকে। দালান, রাস্তাঘাট, বাঁধ, সেতু এ ধরনের বিভিন্ন বাণিজ্যিক ও উন্নয়নমূলক অবকাঠামো নির্মাণকার্যে এই বালির প্রচুর ব্যবহার হয়।

সৈকত বালি ভারী মনিক : বাংলাদেশের উপকূলীয় সৈকত এলাকাগুলোতে এ ধরনের খনিজ পাওয়া যায়। মূলত কক্সবাজার থেকে বদর মোকাম ও মহেশখালী, কুতুবদিয়া ও মাতারবাড়িতে ভারী মনিকের মজুদ রয়েছে। সূক্ষ্ম জরিপকার্য পরিচালনার ফলে বাংলাদেশের সমুদ্র সৈকত বরাবর 17টি স্থানে ভারী মনিকের মজুত লক্ষ করা যায় যেগুলোকে প্লেসার মজুত (Placer deposit) বলা হয়। এগুলোর মাঝে 15টি প্লেসার মজুত কক্সবাজার চট্টগ্রাম সমুদ্রসৈকত ও কাছাকাছি উপকূলীয় দ্বীপসমূহে অবস্থিত। ভারী মনিকের মধ্যে অন্যতম হলো জিরকন, রুটাইল, ইলমেনাইট, ম্যাগনেটাইট, মোনাজাইট, লিউককসেন, কায়ানাইট ইত্যাদি। এসব ভারী মনিক ঢালাই, তাপরোধী বস্তু ও কাচ তৈরিতে এবং জিরকোনিয়াম ধাতু নিষ্কাশনে ব্যবহৃত হয়।

16.3 বনজ সম্পদ

বাংলাদেশের অর্থনীতি ও পরিবেশে বনজ সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের মোট ভূমি এলাকা 1 লক্ষ 48 হাজার বর্গকিলোমিটার, যার প্রায় 18% ভূমি জুড়ে রয়েছে বনভূমি। প্রাকৃতিক এবং মানুষের বানানো উভয় বন নিয়ে এই বনগুলো গঠিত এবং এগুলো বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবাসস্থল।

বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন বাংলাদেশে অবস্থিত এবং এটি ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। সমুদ্রোপকূলে জোয়ার-ভাটার মাঝে টিকে থাকতে সক্ষম বিশেষ ধরনের গাছ এবং ঝোপঝাড়ের বিশেষ বনভূমিকে ম্যানগ্রোভ বন বলে। এই বনটি প্রায় 4 হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে রয়েছে, এটি উপকূলকে রক্ষা করে এবং এটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রল হরিণ, নোনা জলের কুমির

এবং বিভিন্ন প্রজাতির পাখির আবাসস্থল। সুন্দরবন ছাড়াও বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম, শ্রীমঙ্গল এবং মাধবপুরে উল্লেখযোগ্য বনাঞ্চল রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ। শ্রীমঙ্গল এবং মাধবপুর লেক তাদের চা বাগানের জন্য বিখ্যাত।

বন বিভিন্ন পরিবেশগত, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বনের গাছ কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে এবং অক্সিজেন মুক্ত করে জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও বন মাটির ক্ষয়রোধ এবং পানিচক্র বজায় রাখতে সাহায্য করে। বনগুলো অসংখ্য ঔষধি গাছের আবাসস্থল, যা ঐতিহ্যগত বা ভেষজ ঔষধের একটি অপরিহার্য উৎস।

তবে বাংলাদেশের বন সম্পদগুলো বন উজাড়, অবক্ষয় এবং খণ্ডিতকরণসহ বেশ কয়েকটি ঝুঁকির মুখোমুখি হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার বন রক্ষা এবং তাদের আওতা বাড়াতে বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বনজ সম্পদের সুবিধা বজায় রাখতে হলে টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

16.4 পানি সম্পদ

পানি বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। এ দেশটি নদী, খাল এবং জলাভূমির একটি ঘন নেটওয়ার্ক বা জালিকা। দেশটি গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা এই তিনটি প্রধান নদীর বদ্বীপে অবস্থিত, যেটি পৃথিবীর বৃহত্তম নদী বদ্বীপ। এই প্রধান নদীগুলো ছাড়াও 700 টিরও বেশি ছোট নদী এবং উপনদী রয়েছে যা দেশকে অতিক্রম করে। এছাড়া বাংলাদেশের হাওড়াঞ্চলসমূহ ভূপৃষ্ঠস্থ পানি সম্পদের বড়ো উৎস। হাওড়াঞ্চলগুলো মূলত বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব জেলাগুলো, যেমন—সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলার বড়ো অংশ নিয়ে গঠিত। বৃহত্তর সিলেট জেলার গুরুত্বপূর্ণ হাওড়াগুলো হচ্ছে : শনির হাওড়া, হাকালুকি হাওড়া, ডাকের হাওড়া, মাকার হাওড়া, টাঙ্গুয়ার হাওড়া ইত্যাদি। শীতকালে এসব অঞ্চলে পানি কম থাকে এবং কৃষিকাজ করা হয়। তবে বর্ষাকালে হাওড়সমূহ প্রমত্ত রূপ ধারণ করে।

দেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরও আমাদের আরেকটি বিশাল পানি সম্পদ। দেশের পানি সম্পদ আমাদের কৃষি, পরিবহণ, সেচ, পানিবিদ্যুৎ উৎপাদন এবং মাছ ধরা সহ অসংখ্য সুবিধা প্রদান করে। এর পাশাপাশি বঙ্গোপসাগরের গভীরে তেল-গ্যাসের বড়ো উৎস রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। বাংলাদেশের পানি সম্পদ বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং ঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্যও ঝুঁকিপূর্ণ। এই চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, বাংলাদেশ সরকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, নদী ড্রেজিং এবং টেকসই পানি ব্যবহার অনুশীলনের প্রচারসহ পানি ব্যবস্থাপনার উন্নতির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি ও নীতি বাস্তবায়ন করেছে।

16.5 প্রাকৃতিক সম্পদ স্ফটিকের ফলে পরিবেশের উপর প্রভাব

মানব সভ্যতার টিকে থাকা এবং বৃদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ কিন্তু সেটি অপরিবর্তিতভাবে এবং



সদ্য আবিষ্কৃত ভোলা গ্যাস ফিল্ড

অবিবেচকের মতো করা হলে পরিবেশের উপর উল্লেখযোগ্য বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের ফলে পরিবেশের উপর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রভাবগুলোর মধ্যে একটি হলো বাস্তুতন্ত্র এবং বন্যপ্রাণির বাসস্থানের ধ্বংস। এই ধ্বংস প্রায়ই অপরিবর্তনীয় এবং সেগুলো বিভিন্ন প্রজাতির বিলুপ্তি, জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি এবং খাদ্যশৃঙ্খলের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলা যায়, কাঠ সংগ্রহ এবং কৃষিকাজের উদ্দেশ্যে বন উজাড় বনভূমির বিশাল এলাকা ধ্বংস করেছে। যার ফলে মাটির ক্ষয় হচ্ছে, বন্যপ্রাণির আবাসস্থলের ক্ষতি হচ্ছে এবং কার্বন নিঃসরণ বেড়েছে। বন্যপ্রাণির আবাসস্থলের ক্ষতি হলে তারা খাবার এবং আশ্রয়ের জন্য অনেক সময়ে মানুষের আবাসস্থলে চলে আসে, তখন এই বন্যপ্রাণির দেহ থেকে রোগের জীবাণু মানুষের দেহে সংক্রমণ হতে পারে। সাম্প্রতিক পৃথিবীব্যাপী করোনাভাইরাসের অতিমারির কারণ হিসেবে এই ধরনের ঘটনাকে সন্দেহ করা হয়।

তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের মতো জীবাশ্ম জ্বালানির নিষ্কাশনও পরিবেশে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে। এসব নিষ্কাশন প্রক্রিয়ার ফলে গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ এবং তার পাশাপাশি বায়ু এবং পানি দূষণ হতে পারে। জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো জলবায়ু পরিবর্তনে অবদান রাখে, যা পরিবেশ এবং মানব সমাজের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

খনি থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলন প্রক্রিয়া পরিবেশে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। খনি খননের জন্য প্রচুর পরিমাণে মাটি এবং শিলা অপসারণ করতে হয়, যার ফলে ভূপৃষ্ঠের উপরের সবুজ ঘাসের আবরণ এবং মাটির ক্ষয় হয়। তাছাড়াও খননের ফলে বিষাক্ত রাসায়নিক এবং ভারী ধাতু বায়ু এবং জলে নির্গত হতে পারে, যেগুলো পরিবেশ এবং মানব-স্বাস্থ্যের উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে।

16.6 প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা

আমরা দেখেছি প্রাকৃতিক সম্পদের ধরন এবং তার প্রাপ্যতার মাঝে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। খনি থেকে যে সকল সম্পদ পাওয়া যায় তা প্রায় সবই অনবায়নযোগ্য, যেমন—কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল, চুনাপাথর কিংবা চীনামাটি প্রভৃতি খনি থেকে তুললে সেগুলো আর ফিরে পাওয়া যাবে না। এছাড়া অতিরিক্ত খনিজ সম্পদ আহরণ করা হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এসব সম্পদের ঘাটতির সম্মুখীন হবে। অতিরিক্ত খনন করা হলে ভূপৃষ্ঠের উর্বর জমি নষ্ট হয়, যার কারণে সেগুলো কৃষিকাজ ছাড়াও অন্য কাজেরও উপযোগিতা হারায়।

যে সকল সম্পদ নবায়নযোগ্য সেগুলো ব্যবহার করা নিরাপদ। এগুলো ব্যবহার করলে অদূর ভবিষ্যতেও সম্পদের ঘাটতি হবে না। যেমন—সৌরশক্তি, জোয়ার-ভাটার শক্তি, বিদ্যুৎ শক্তি, বায়ু শক্তি এগুলো নবায়নযোগ্য সম্পদ এবং অদূর ভবিষ্যতে শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে ভূগর্ভস্থ পানি, বনভূমি, কৃষিজমির মাটি নবায়নযোগ্য সম্পদ হলেও অতি ব্যবহারে অদূর ভবিষ্যতে এগুলোর ঘাটতি হতে পারে। এজন্য যেখানে সম্ভব সেখানে নদী বা খাল-বিলের পানি ব্যবহার করে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। বন থেকে গাছ কাটা বন্ধ করতে হবে এবং নতুন গাছ লাগাতে হবে।

এই দেশ এবং এই পৃথিবী আমাদেরই আবাসস্থল। একে বসবাসযোগ্য রাখতে হলে আমাদের অবশ্যই এর প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সম্পদ সংরক্ষণ করতে হবে। দেশের নাগরিক হিসেবে সবাইকে অবিবেচকের মতো প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের বিরূপ প্রভাবগুলোর কথা জানতে হবে এবং পরিবেশের ক্ষতি কম করে এ ধরনের টেকসই অনুশীলনের পক্ষ সমর্থন করতে হবে। যেখানে সম্ভব নবায়নযোগ্য শক্তির উৎসগুলো ব্যবহার করতে হবে, বর্জ্য উৎপাদন এবং সম্পদের ব্যবহার কমাতে হবে। এভাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বাস্তুতন্ত্র রক্ষার প্রচেষ্টায় সবাইকে অংশগ্রহণ করতে হবে।

